OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 09 - 19
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 09 - 19
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

মহাকাব্যকথা বয়নে প্রথম বাঙালি নারীর আত্মপ্রকাশ : চন্দ্রাবতীর রামায়ণ

সুপ্রীতি হাজরা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : supritihazra93@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Chandrabati's Ramayana, Madhyayuger bangla sahitya, Stylistic analysis, Sixteenth century, Chandrakumar De, Nabaneeta Dev Sen, Sita.

Abstract
Epic literature encompasses a nation's entire geography, time, thoughts, traditions, experiences, and culture. The Ramayana, a venerable masterpiece, is a cherished gem of Indian literature. Over the course of history, it has not only impacted the mindset of people in India but also had a significant influence on the literature and culture of different parts of the globe. The Ramayana, initially written in Sanskrit, has undergone multiple reinterpretations by various poets in different regional languages of India throughout the centuries. These poets have embraced the Ramayana and adapted it to their own languages and cultures, giving it new shapes while still maintaining the fundamental plot. The scope of our study article is centred on the analysis of Chandrabati's Ramayana, which originates from the Mymensingh district of East Bengal during the sixteenth century. Our main objective is to examine the unique characteristics of its composition. In contrast to the conventional epic framework, this narrative portrays the influence of the Ramayana on the realm of female intellect and awareness. This rendition emphasises the character of Sita, her story, and her hardships more than Rama. The Ramayana was extensively transmitted through oral tradition among the women in the Mymensingh district. Later on, the information was gathered and documented by different individuals who specialise in collecting and studying such materials. This research paper examines the poet Chandrabati and her life, the way her life is portrayed in the Ramayana narrative, the distinctiveness and originality of the story, the portrayal of love and marriage, and the significance of the narrative style of the Ramayana as written by a woman during that time period.

Discussion

"আমরা যা গাই সে সব তো আর সাহিত্য নয়, নেহাৎ মেয়েলী ছড়া– দূর দূর"[1]

'বামাবোধিনী' উপন্যাসের মারাঠি চরিত্র কমলার মুখে আমরা এমন কথা শুনলেও, সে সুযোগ আমাদের দেন না কবি চন্দ্রাবতী। সেই ষোড়শ শতকে বসেই তিনি যখন রামায়ণীকথা রচনা করেন, সে সময় মধ্যযুগীয় বাঙালি সমাজে নারীর কাছে গৃহসংসার, পুত্রপালন এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অধীনতা ভিন্ন অন্য জগৎ ছিল না— শিক্ষা তো দূরের কথা। সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ অঞ্চলের এক নিভৃত পল্লীতে বসে রামায়ণী কথায় এক নারী খুঁজে নিচ্ছেন তাঁর মননচর্চার ক্ষেত্র, সেই অর্থে বাংলা সাহিত্যে প্রথম যথার্থ রূপে এক নারীর আত্মপ্রকাশ। একালের গবেষক, সমালোচকের ভাষায় যা 'সীতায়ণ' বলে বিবেচিত হয়— সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে তা অবশ্যই যেমন নতুন, তেমনি সাহসী পদক্ষেপ।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পাঠ করতে গেলে অনুবাদ সাহিত্যধারায় রামায়ণ রচনার অন্যতম কবি হিসাবে চন্দ্রাবতী নামে এক মহিলা কবির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। অন্যদিকে, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ-গীতিকার' ভূমিকা এবং ওই সংকলনে প্রকাশিত কবি নয়ানচাঁদ ঘোষের চন্দ্রাবতী পালা থেকে কবির ব্যক্তিজীবন ও রামায়ণ রচনার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। অতঃপর দীনেশচন্দ্রের সম্পাদনায় 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় এবং ক্ষিতীশ মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সপ্তম খণ্ডে উক্ত রামায়ণ পাঠ রামায়ণ রচনা ধারায় এক নতুনত্বের স্বাদ এনে দেয়। সাহিত্যে নারী মননের প্রকাশ রূপে ভাবনার অভিনবত্ব এবং ভাষা ব্যবহারের যে বৈশিষ্ট্য, তাও আবার বাঙালি সমাজে সুপরিচিত রামায়ণের মত মহাকাব্যের বিষয়কে ক্ষেত্র ভূমি করে— এই বিষয়টি বিশেষ কৌতুহলের সৃষ্টি করে। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ নিয়ে ইতিপূর্বে বেশ কিছু আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে। বিশেষত নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তে নবনীতা দেবসেনের আলোচনা এবং কোয়েল চক্রবর্তীর একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা গ্রন্থ 'চন্দ্রাবতীর জীবন ও রামায়ণ' - এর কথা উল্লেখ্য। 'ভাষাগত বিশিষ্টতা' শীর্ষক অংশে কোয়েল চক্রবর্তী সেখানে উপভাষা এবং মেয়েলি ভাষা ব্যবহারের নিরিখে একটি আলোচনা রেখেছেন। সে যুগের শিক্ষিত এক নারী মন সাহিত্যে প্রকাশের পথ খুঁজেছে যেভাবে আমরা চিনে নিতে চেয়েছি সেই স্বতন্ত্র পথটিকে, যার মধ্যেই ধরা দেয় আধুনিক নারী মনের আভাস।

ব্যক্তিগত জীবনে কবি চন্দ্রাবতী এবং তাঁর সময়কাল :

যাঁর রামায়ণ নিয়ে আমাদের এত উৎসাহ— কে এই কবি চন্দ্রাবতী? কোথায় বা তাঁর বাস? কোন সময় তিনি বর্তমান ছিলেন? এ সকল প্রশ্ন স্বভাবতই আসে। এ প্রসঙ্গে যার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য, তিনি হলেন লোকগাথা, ছড়া সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে, যিনি সর্বপ্রথম তৎকালীন পূর্ববঙ্গের 'সৌরভ' পত্রিকায় 'মহিলা কবি চন্দ্রাবতী' র কথা সকলের সামনে আনেন। আনুমানিক ১৫৫০ খ্রিসটাব্দে, কবি চন্দ্রাবতী, বর্তমান মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায় 'পাতুয়ারী' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দ্বিজ বংশীদাস তৎকালের এবং ঐ অঞ্চলের সুবিখ্যাত মনসাভাসান পালার রচয়িতা ও গায়ক। মাতার নাম সুলোচনা। ছোটোবেলা থেকেই পুরাণকথা শুনে তাঁর বড়ো হওয়া। দ্বিজ বংশীদাসের এই সুযোগ্যাকন্যা ওই অঞ্চলের শুধু একজন নারী হিসাবেই নয়, বাংলা লোকোসাহিত্যে সেকালের একজন কবি হিসাবেও তিনি সুবিখ্যাত। পরবর্তীকালে, চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত এবং দীনেশ্চন্দ্র সেন সংকলিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় প্রকাশিত, কবি নয়ানচাঁদ ঘোষ রচিত 'চন্দ্রাবতী' পালায় কবির জীবনকথার পরিচয় পাওয়া যায়।

কবি ছিলেন তথাকথিত শিক্ষিত, ছোটোবেলা থেকেই সংস্কৃত পুরাণাদি বিভিন্ন সাহিত্যপাঠে অভ্যস্থ। উল্লেখ্য, সেকালের মানুষ হয়েও তাঁর পিতা-মাতার উন্নত মানসিকতা। সঙ্গে ছিলেন পারিবারিক সূত্রেই মনসা ও শিবের ভক্ত। বাল্যসখা জয়ানন্দের সঙ্গে সুসম্পর্ক যৌবনে প্রেম-পরিণতি পায় এবং ঘটনাচক্রে দুই পরিবারের সম্মতিক্রমে বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু, বিবাহের আয়োজন চলছে যখন চন্দ্রাবতীর গৃহে এমন সময়, আকস্মিক ঝোড়ো হাওয়ার মতো খবর আসে—

"পাপেতে ডুবাইল নাগর চৌদ্দ পুরুষের নাম।। ...
যবনী করিয়া বিয়া জাতি কৈল মার।।"[২]

এক মুসলমান কন্যার মোহে পড়ে তাকে বিবাহ করে জয়ানন্দ বিধর্মী হল। তখন—

"না কান্দে না হাসে কন্যা নাহি বলে বানী।

আছিল সুন্দরী কন্যা হইল পাষাণী।।”[৩]

অতঃপর, চন্দ্রাবতী সিদ্ধান্ত নিলেন আর বিবাহ না করার এবং ঈশ্বর সাধনায় রত হওয়ার। মেয়ের এ প্রার্থনায় রাজি হয়ে পিতা আদেশ দিলেন –

“শিবপূজা কর আর লেখ রামায়ণে”[৪]

কিছুকাল পর, জয়ানন্দ তার ভুল বুঝতে পেরে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য প্রথমে চন্দ্রাবতীর নিকট পত্র প্রেরণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এরপর একদিন সে আসে চন্দ্রাবতীর সাক্ষাৎ পাবার আশায়। সেদিন চন্দ্রাবতী রুদ্ধদ্বার মন্দিরগর্ভে শিবের ধ্যানে মগ্ন। বাইরে থেকে জয়ানন্দ শত ডাকলেও কোনো উত্তর মেলে না। একে চন্দ্রাবতীর প্রত্যাখ্যান বলে মেনে নিয়ে জলে ডুবে আত্মহত্যা করে জয়ানন্দ। এদিকে, তপস্যা শেষে মন্দিরের বাইরে ‘মুসলমান’ জয়ানন্দের আগমনের চিহ্ন দেখে ক্ষোভবশত মন্দির পবিত্র করতে নদীর ঘাটে জল আনতে গিয়ে দেখে—

“জলের উপরে ভাসে জয়ানন্দের দেহ।।”[৫]

— এই দৃশ্য দেখে,

“আঁখিতে পলক নাহি মুখে নাই সে বাণী।
পারেতে খারাইয়া দেখে উমেদা কামিনি।।”[৬]

— এরপর, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত চন্দ্রাবতী আর বেশিদিন বাঁচেননি, আনুমানিক ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ রচনার কাল ও কাহিনিবিন্যাস :

উপরিউক্ত আলোচনার সূত্র ধরে একথা স্পষ্টত বলা যায় যে, জয়ানন্দের কৃতকর্মের ভুল বুঝে ফিরে আসার আগেই কবির রামায়ণ রচনার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। অন্যদিকে, দেখা যায় গবেষকদের মতে ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’র দুটি পালা ‘মলুয়া’ ও ‘দস্যুকেনারামের পালা’ চন্দ্রাবতীর রচনা। এই পালাগুলি রচনার আগেই তিনি সম্ভবত রামায়ণ রচনা করেন। অনেক সমালোচক এর মতে যা অপরিণত লেখা। সুতরাং, এ থেকে অনুমান করা যায়, আমাদের প্রাপ্ত চন্দ্রাবতীর রামায়ণটি ষোড়শ শতকের শেষের দিকের রচনা। কাহিনি বিন্যাসের প্রাথমিক পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, মহাকাব্যের কাঙ্ক্ষিত বিপুল পরিসর এতে নেই। রামায়ণটি পাঠ করতে গিয়ে প্রথমেই যে বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় তা হল— রামায়ণের পরিচিত কাহিনি কবি নিয়েছেন ঠিকই কিন্তু তাঁর লেখায় রামের কথার থেকে সীতার কথাই বেশি। কাহিনি শুরু হয়েছে ‘লঙ্কার বর্ণনা’ তথা সীতা জন্মের প্রেক্ষাপট রচনার মাধ্যমে। উল্লেখ্য, সীতা এখানে রাবণপত্নী মন্দোদরীর গর্ভজাত কন্যা। কাহিনির প্রথমেই আছে রাবণ কর্তৃক স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল বিজয়; এরপর, ‘মন্দোদরীর গর্ভসঞ্চার ও ডিম্ব প্রসব’; ‘মাধব জালিয়া ও সতা জাল্যানীর’র কাহিনি; ডিম ফুটে জনক রাজার ঘরে সীতার জন্ম, অন্যদিকে, ‘রামের জন্ম’ বর্ণনা। এরপর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, ‘সীতার বারমাসী’র কথার সূত্রে বলা হয়ে যায়, রাম, সীতা, লক্ষ্মণের বনবাস, রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের ঘটনা, রাম-রাবণের যুদ্ধ, সীতা-উদ্ধার ইত্যাদি যাবতীয় মূল রামায়ণের ঘটনা। তৃতীয় পরিচ্ছেদে রাম কর্তৃক আবার সীতা কে বনবাসে পাঠানোর প্রেক্ষাপট, বনবাসে সীতার দুঃখ-কষ্ট যাপন, বাল্মীকিমুনির আশ্রমে দুই পুত্রকে পালন করা, অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রয়োজনে সীতাকে আনয়ন, রামকর্তৃক আবার অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে সীতাকে পরিশুদ্ধির প্রসঙ্গ এবং অবশেষে ব্যথিত সীতার পাতাল প্রবেশ দিয়ে কাহিনির সমাপ্তি।

প্রাপ্ত কাহিনিতে দেখা যায়, বিষয়ের দিক থেকে বাল্মীকি-কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের কাহিনির প্রাধান্য। চরিত্রের দিক থেকে রাম নয় সীতার কথাই গুরুত্ব পেয়েছে। সীতার আবির্ভাব, সারাজীবনব্যাপী রামের পত্নী রূপে কীরূপ যন্ত্রণা ও কষ্ট পেয়েছে সীতা, বিশেষত প্রেমে ও দাম্পত্যে অবিশ্বাস জনিত সৃষ্ট দুর্ভোগের শিকার হয়েছে সে, সে কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। নারী হিসাবে তার সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্তের সহচরী হয়েছেন কবি। ‘সীতা থেকে শুরু’ যে কাহিনির সীতার পথ অনুসরণ করেই তা শেষ হয়েছে— তাই এ কাব্য সমালোচকের কাছে ‘সীতায়ণ’ আখ্যা পায়।

কবির নিজস্ব ভাবনা ও ভাষার আলোকে :

কবি চন্দ্রাবতীর জীবন সম্পর্কে জানার পর আমরা লক্ষ করব, কবি তাঁর রামায়ণ কাহিনিতে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে একটু বেশি আলোকপাত করেছেন। যা কাহিনি পরিবেশনার ক্ষেত্রে কবির ভাবনার অভিনবত্বের দাবি রাখে। তা হল — মূলত দাম্পত্য সম্পর্ক, সেই সম্পর্কে বিশ্বাস ও বিশ্বাসভঙ্গের কাহিনি। এক্ষেত্রে, এমন দুটি দাম্পত্য সম্পর্কের কথা পাই, যাদের মধ্যে একটি দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্রায়ণে এ কাহিনির শুরু এবং অন্য দাম্পত্য সম্পর্কটির পরিণতিতে কাহিনিরও সমাপ্তি।

রাবণ, মন্দোদরীর বিশ্বাসভঙ্গ করে অন্য 'দেবকন্যা', 'গন্ধর্ব্ব কুমারী'দের সঙ্গে দিনাতিপাত করেছে। মন্দোদরী মনে আঘাত পেয়েছে। একদিকে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে রাবণের অত্যাচার, গন্ধর্ব্ব কন্যাদের প্রতি বলপ্রয়োগ অন্যদিকে, মন্দোদরীর প্রেমে বিশ্বাসঘাতকতা তথা নারীর লাঞ্ছনা— সেই সূত্রেই রাবণের পাপের শাস্তি দিতেই যেন জন্ম নিলেন সীতা। মন্দোদরীর গর্ভে, ঋষিদের পুণ্যরক্তের বীজে।

সীতা ও রামের দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রেও লক্ষ করার বিষয়, সীতা রামকে অন্ধের মতো ভালোবেসেছে। বিশ্বাস করেছে। চোদ্দ বনবাসে তাদের তাদের বন্ধুত্ব ও প্রেমে দাম্পত্য সম্পর্ক পূর্ণতা পেয়েছে। কিন্তু সেই রাম অন্যের কথা শুনে, ক্ষনিকের অবিবেচনাবশত সীতাকে নির্মমভাবে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। একমাত্র অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রয়োজনেই রাম সীতাকে ফিরিয়ে আনার উপদেশ মেনে নিয়েছে। কিন্তু সীতাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেও তার অগ্নিপরীক্ষা চেয়েছে। সীতার আত্মমর্যাদায়, চরিত্রের পবিত্রতায় এভাবে বার বার আঘাত হেনেছে রাম। সীতার বিশ্বাস অবশেষে ভেঙে গেছে। সীতা 'বসুমতী মাতা'র কোলে আশ্রয় নিয়েছে। পাতালে প্রবেশ করেছে। সীতার এহেন লাঞ্ছনার কাহিনিকে অনায়াসে আমরা কিছুটা হলেও চন্দ্রাবতীর প্রেমে বিশ্বাসভঙ্গের কাহিনি সূত্রে মিলিয়ে নিতে পারি। সীতা যেভাবে চিরনীরবতার অন্তরালে প্রবেশ করেছিল, চন্দ্রাবতীও মৌনতা অবলম্বন করেছিল।

রাম কর্তৃক নির্বাসিত সীতার বনবাসে যে ধ্যানতন্ময়, স্নিগ্ধ অথচ তেজস্বী মূর্তি, তার মধ্যে প্রেমে আঘাতপ্রাপ্ত চন্দ্রাবতীও নিজ আদর্শ নারীমূর্তিকে খুঁজে পেয়েছিলেন। 'সীতা থেকে শুরু' যে নারী জীবনের অভিজ্ঞতা, সেখানে পুরুষের খেয়ালি মনের কাছে চন্দ্রাবতীরও হৃদয়ভঙ্গ হয়েছিল। তাই আলোচ্য রামায়ণীকথায় কবি চন্দ্রাবতীর ব্যক্তিজীবনের বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রতিফলনের ঝলক তাই একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না।

এখন স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ব্যক্তির ভাষাপ্রয়োগের বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। 'ব্যক্তির ভাষা প্রয়োগের নিজস্বতাকেই আমরা শৈলী'[৭] বলে চিহ্নিত করে থাকি। 'শৈলীবিজ্ঞানী ক্রিস্টাল ও ডেভি তাঁদের গ্রন্থে শৈলীর যে আটটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা চিহ্নিত করেছেন'[৮], চন্দ্রাবতীর রামায়ণকে সেই মাত্রাগত আলোচনার আলোকে রাখলে, দেখা যায়—

ক. স্বকীয়তা : 'রচনা লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলক'[৯], কবি চন্দ্রাবতীর রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের রামায়ণীকথায় উন্মোচিত হয় এক নারীবাদী স্বর। যেখানে কৃত্তিবাসে সীতাকে দ্বিতীয়বার বনবাসে পাঠানোর জন্য কাজ করেছিল রামের অভিমান—

"অভিমানে চক্ষুর লো পড়ে ধারে ধারে"[১০]

সেখানে, গর্ভবতী সীতাকে বনে পাঠিয়ে চন্দ্রাবতীর রাম যে ভুল করেছে তার স্পষ্ট স্বীকার তথা দোষারোপ দেখি—

"পরের কথা কানে লইলে গো নিজের সর্বনাশ।
চন্দ্রাবতী কহে, রামের গো বুদ্ধি হইল নাশ।।"[১১]

এখানে রামের প্রতি মৃদু ভর্ৎসনা লক্ষণীয়। এমনকি, রামভক্ত হনুমানও এখানে সংশয় প্রকাশ করে রামের চরিত্র মহিমায়—

"রামলীলা শেষ হইব গো বীর ভাবে মনে মনে।
ভাইব্যা চিন্তা হনুমান গো রইল মুনির তপোবনে।।"[১২]

উল্লেখ্য হনুমান চরিত্র এই রামায়ণে এক অভিনব ভূমিকায়, আখ্যানে যার আগমন শুধুমাত্র সীতার সমব্যথী রূপে। এক্ষেত্রে খলচরিত্র হিসাবে কুকুয়া চরিত্রের সংযোজনও বিশেষ গুরুত্বের দাবি করে।

আবার ভাষা প্রয়োগের দিকে লক্ষ করলে প্রাথমিক ভাবেই নজরে আসে প্রায় প্রতি ছত্রে 'গো' এই শব্দের ব্যবহার। যা মেয়েদের ভাষাতেই বেশি দেখা যায়। যেমন,

"সাগরের পারে আছে গো কনক ভুবন।
তাহাতে রাজত্বি করে গো লঙ্কার রাবণ।"[১৩]

এখানে কথক হিসাবে মহিলাকণ্ঠকে চিনে নেওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মালয়েশিয়ার রামায়ণের কাহিনির সঙ্গে অদ্ভুত তথ্যগত মিল লক্ষ করেছেন গবেষকগণ। এছাড়াও দেশ-বিদেশের অন্যান্য বেশকিছু মৌখিক ও লিখিত রামকথার সঙ্গে এই ধরনের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সেকালে বসে চন্দ্রাবতী হয়তো প্রত্যক্ষত এসকল কাহিনির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। সেক্ষেত্রে বলা যায়, পূর্বমৈমনসিংহ অঞ্চলের ইতিপূর্বকাল থেকে চলে আসা ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কথা। একদিকে যেমন এই অঞ্চল লক্ষ্মণসেনের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব মুক্ত ছিল, তেমনি বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব ঐতিহ্যক্রমে বজায় ছিল কামরূপ তথা প্রাগজ্যোতিষপুরের শাসনের কাল থেকেই। মুসলমান সংস্কৃতি ও ভাষা-প্রভাব এসেছিল সামাজিক সহাবস্থান থেকে, কিন্তু নিজস্ব পুরানো হিন্দু সংস্কৃতি ও তার চর্চা বজায় ছিল। আর, কবি সম্পর্কে আমরা জেনেছি যে তিনি সংস্কৃত পুরাণ, মহাকাব্য পাঠ করতেন। তাই কবির ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের আত্তীকরণ ঘটেছে তাঁর কাব্যে তথা আমাদের আলোচ্য তাঁর রামায়ণ গাথাটিতে।

খ. কাল : কবির জীবনকাল এবং রামায়ণ রচনার কালের আলোচনা প্রসঙ্গে এই অনুমানে আসা গেছে যে, কবি চন্দ্রাবতী ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের বেশ কিছু আগেই এই রামায়ণ রচনা করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তখন মধ্যযুগ, এই রচনাটিও অনুবাদ সাহিত্যের ধারায় একটি সংযোজন। এক্ষেত্রে কালগত প্রভাবের যে সকল বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে তার মধ্যে –

- চন্দ্রাবতীর এই রামায়ণ কথায় দৈবনির্বন্ধের কথা এসেছে বেশ কয়েকবার। যেমন,
  "দৈবের নিবন্ধ কভু গো না যায় খন্ডানি"[১৪]
  কিংবা, "কপালের দোষে আমার গো না হইল সংসার"[১৫] — এই জাতীয় বাক্যে তা লক্ষণীয়।
- মধ্যযুগের বাংলাকাব্যের একটি পরিচিত গঠন নারীর বারোমাসি দুঃখের কথা বর্ণনা। রাম-সীতা-লক্ষ্মণের চোদ্দ বছরের বনবাস প্রসঙ্গ এখানে 'সীতার বারোমাসী' বর্ণনায় রূপান্তরিত।
- সেকালের সাধারণ নারী পুরুষের সংসারের দারিদ্র্যের চিত্র যা বারে বারে মঙ্গলকাব্যগুলিতে উঠে এসেছে – চন্দ্রাবতী মহাকাব্য কথা লিখতে গিয়েও সে প্রসঙ্গ বাদ দিতে পারেন নি। সীতার অভিনব জন্মবৃত্তান্ত এনে মাধব জেলে ও তার স্ত্রী সতার দারিদ্র্যপূর্ণ সংসারের ছবি এঁকেছেন কবি মহাকাব্যের কাহিনিতে। অভিনব হলেও একটি স্নিগ্ধ পল্লীর এক মহিলা কবির হাতে এই বঙ্গপ্রকৃতির, সমাজের নিজস্ব চিত্রই বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে—

"নগরের মাঝে মাধব গো সবার দীনহীন।
হাটের চাউল ঘাটের পানি গো দুঃখে যায় দিন।।
পিন্ধনে কাপড় নাই গো পেটে নাই ভাত।
রাত্রদিন ভাবে সতা গো শিরে দিয়া হাত।।"[১৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য চন্দ্রাবতী কোন রাজসভাসদ বা রাজার পৃষ্ঠপোষনায় এ কাব্য রচনা করেননি।

- সেকালের গ্রামের মহিলাসভায় মহিলাকথকের যে মহাকাব্যকথা বা পুরাণ বিষয়ক গল্প শোনানোর রীতি ছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে সখীদের কাছে সীতার বারোমাসের দুঃখের কাহিনি শোনানোর প্রসঙ্গে —

"সুখ বসন্তের কথা গো শুন সখীগণ"[১৭]

- যেহেতু দীর্ঘকাল বাংলায় রাজনৈতিক, সমাজ ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থান ও ভাষাবিনিময় চলেছিল, তাই বাংলা ভাষাতেও বেশ কিছু আরবি-ফারসি শব্দ চলে আসে। চন্দ্রাবতীর ভাষা ব্যবহারেও তা লক্ষণীয়। যেমন, 'আশমান', 'জমিন', 'পানি', 'বহুত' ইত্যাদি।

গ. উপভাষা : চন্দ্রাবতীর যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তাতে দেখি কবি সমগ্র বাংলাভাষী অঞ্চলের মধ্যে বঙ্গালী উপভাষার সীমায়িত অঞ্চলের বাসিন্দা। রামায়ণ রচনায় তিনি মূলত ঐ অঞ্চলে প্রচলিত মুখের ভাষাকেই ব্যবহার করেছেন। শ্রীমতী কোয়েল চক্রবর্তী তাঁর গবেষণা গ্রন্থে বিশদে বঙ্গালী উপভাষার যে সকল প্রবণতা এই রামায়ণের ভাষাগ্রন্থনে লক্ষ করা যায় সেগুলি তুলে ধরেছেন। এখানে অতিসংক্ষেপে উল্লেখ করতে পারি— বঙ্গালী উপভাষার অপিনিহিতির প্রবণতা; ধ্বনি পরিবর্তনের ধারায় তৎসম শব্দের নাসিক্য ব্যঞ্জনের লোপ না হওয়া; ও>উ বা উ>ও এর পরিবর্তন; 'ক' স্থানে 'গ' উচ্চারণ প্রবণতা বা রূপতাত্ত্বিক পরিবর্তনের বেশ কিছু ভাষিক বৈশিষ্ট্য এই রামায়ণে আমাদের চোখে পড়ে।

ঘ. অধিবাচন/সন্দর্ভ : যদিও সংগ্রহের পূর্বে চন্দ্রবতীর এই রামায়ণ উক্ত অঞ্চলের নারীসমাজ এবং পালাগায়কদের মুখেই তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল তাই একাধারে এর প্রাথমিক পরিচয় মৌখিক সাহিত্য হলেও, কবি তাঁর রচনার যে লিখিত রূপ দিয়েছিলেন একথার প্রমাণ মেলে তা প্রসঙ্গত উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ, পূর্ববর্তী সংগৃহীত রামায়ণের লিখিত রূপে গ্রন্থপ্রকাশ, গবেষণা ও সমালোচনার সূত্র ধরে সাহিত্যের বিচারে এ সন্দর্ভের মাধ্যম লিখিত সাহিত্যরূপ হিসাবেই এখানে গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্যদিকে লক্ষণীয়,

- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কথক গল্প বলার ছলে কাহিনি ব্যক্ত করেছেন—

  "সীতার জনম কথা গো শুন মন দিয়া।।"[১৮]

- প্রায় প্রতিটি চরিত্রের মুখেই কখনো না কখনো সংলাপও বসানো হয়েছে। যথা, মন্দোদরী ও রাবণের সংলাপে–

  "মন্দোদরী : কিবা ধন আনিয়াছ গো কটরায় ভরিয়া!...
  রাবণ : সতত আমার বৈরী গো যত দেবগণ।...
  যত্ন করি এই কৌটা গো তুল্যা রাখ ঘরে।"[১৯]

- আবার সখীজন মাঝে বসে সীতা ও রামের পাশা খেলার দৃশ্যে কথার বয়নে সীতা, রাম ও সখীরা অর্থাৎ, বক্তা-শ্রোতা যেখানে বর্তমান সেখানে তৃতীয় কণ্ঠ হিসাবে কবিকণ্ঠ তথা কথক প্রবেশ করার ফলে একটা 'Free indirect discourse'- এর সৃষ্টি হয়। যথা,

  "চুম্বন করিয়া সীতায় গো বলেন রঘুবর।
  যাহা ইচ্ছা মনোমত গো বাছি লও বর ।।
  চন্দ্রা কহে পোহাইল গো সুখের রজনী।
  সাবধানে মাগ বর গো জনক নন্দিনী।। ...
  বহুদিন হইতে মোর গো আশা ছিল মনে।
  আর বার বেড়াইব গো পুন্য তপোবনে।।"[২০]

- এই গল্প বলার ছলেই অনুসৃত হয়েছে ফ্ল্যাশব্যাক রীতি—

  "এক ত দিনের কথা গো শুন সখীগণ।
  চাইর বইন আছি গো মোরা মিথিলা ভুবন।।
  আনন্দে কাটয়ে গো শৈশবের বেলা।..."[২১]

এইভাবে রামায়ণের মূল আখ্যান বলে আমাদের কাছে যা পরিচিত তার অধিকাংশই সীতা ও রামের শৈশব থেকে বিবাহ, বনবাস, সীতাহরণ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, সীতা উদ্ধার, সব কথাই আসে ওই স্মৃতি রোমন্থনের সূত্রে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 09 - 19
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কেউ কেউ এই সূত্রে আধুনিক রচনাশৈলী নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে এতে দেখেছেন মধুসূদনের ‘মেঘনাদ বধে’র ছায়া, দীনেশচন্দ্র সেন আবার বলেছেন,

> “মাইকেল মধুসূদন সীতা-সরমার কথোপকথনের অংশটি চন্দ্রাবতীর রামায়ণের একটি স্থল হইতে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।”[২২]

এক্ষেত্রেও একটা কথা আবারও মনে রাখতে হবে যে, মধুসূদন রামায়ণের কাহিহির যখন বিনির্মাণ করেছেন উনিশ শতকে, তখন প্রাচ্যের সাথে সাথে পাশ্চাত্য সাহিত্যভুবনের সাথেও তাঁর পরিচয় ছিল, সেই সকল আদর্শকে অনুসরণ করে মধুসূদনের নির্মাণ সেক্ষেত্রে সচেতন কাব্যিক প্রয়াস। অন্যদিকে, ষোড়শ শতকের বাংলার পল্লীগ্রামের এক নারী চন্দ্রাবতীর পরিবার সূত্রে মহাকাব্য পুরাণাদি পাঠের প্রসঙ্গ পাওয়া গেলেও এটা দাবি করা যায় না যে, দেশ-বিদেশের সাহিত্যের সাথে তার পরিচয় ছিল। তাই এক্ষেত্রে লেখনীতে যে আধুনিকতার ছাপ বর্তমানের সমালোচক, গবেষকের চোখে পড়ে তা যেহেতু দীর্ঘকালব্যাপী মানুষের তথা গায়েনদের মুখে মুখে ওই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, পরবর্তীকালের গায়েনদের দ্বারা প্রক্ষেপজাতও হতে পারে আবার, হয়তো তা কবির মনের নিজস্ব ভাবনারই প্রতিফলন। হয়তো গল্প বলার যে ভঙ্গি প্রাচীণকাল থেকেই কথকের মুখে মুখে চলে আসছে সেই ভঙ্গি সহজেই কবি দ্বারা অনুসৃত হয়ে নতুন আলো পেয়েছে এ কাব্যের কথাবয়নে। সেক্ষেত্রে সাহিত্যে শৈলীবিচারে এই স্টাইলে পরিবেশন যতই আধুনিক আখ্যা লাভ করুক, এটা কবির অসচেতন প্রয়াস, যা সেই সময়ের চেয়ে এগিয়ে অন্য মাত্রা পেয়েছে।

ঙ. রচনার এলাকা : চন্দ্রকুমার দে’র প্রদত্ত তথ্য থেকে আমরা জেনেছি সংগ্রহের পূর্বে তিনি দেখেছেন মৈমনসিংহ অঞ্চলের ঘরে ঘরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নারীদের মুখে মুখে এই রামায়ণ গীত হতে। ‘শুন সখীগণ…’, ‘সখী সভা মাঝে ভণে… ’কথাগুলি ধুয়ার মতো এসেছে।

- ধ্বনি ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্যে মেয়েলি ভাষার পরিচয় মেলে। যথা,
  রাজত্ব > রাজত্বি; স্বামী > সোয়ামী; ত্রিভুবন > তিরভুবন; প্রতিমা > পিরতিমা ইত্যাদি।

শিক্ষা ও সচেতনতা তথাকথিত গ্রামীন মেয়েদের কম হওয়ায় তারা উচ্চারণের ক্ষেত্রে সরলীকরণ পন্থার বশীভূত হয়। উক্ত ধ্বনি পরিবর্তনগুলির ক্ষেত্রে কোথাও সমীভবন, তো কোথাও স্বরভক্তি জাতীয় ধ্বনি পরিবর্তন ঘটেছে।

- শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়দের সম্বোধনের ক্ষেত্রে মেয়েদের স্বতন্ত্র শব্দভান্ডার থাকে। উপরন্তু, সেকালের সামাজিক প্রেক্ষিতটাও স্মরণীয়। তাই সীতার মুখে ‘রাম’ প্রসঙ্গে ‘প্রভো’ সম্বোধন, দেবর লক্ষ্মণ প্রসঙ্গে ‘ঠাকুর লক্ষ্মণ’ সম্বোধন লক্ষ করা যায়।
- চন্দ্রাবতীর এই রামায়ণে vocative particles– ‘গো’ প্রায় প্রতিটা ছত্রে যুক্ত হয়েছে, কোথাও বা ‘ওগো’ শব্দের ব্যবহার; মেয়েদের ভাষা ব্যবহারে স্বাভাবিক যে নমনীয়তার প্রতি আকর্ষণ যেমন, দীর্ঘ > দীঘল; পুতুল সদৃশ > পুতুলাখানি ইত্যাদি; মেয়েদের ভাষা ব্যবহারেই লক্ষিত হয় এমন কিছু প্রত্যয় যেমন, ‘-নি’, ‘-অন্তি’ ইত্যাদি যুক্ত শব্দ ‘আগুনী’, ‘জ্বলুনি’, ‘ফল-ফলান্তি’ ইত্যাদির ব্যবহার লক্ষণীয়।
- ঘরোয়া মেয়েলি পরিবেশের গল্পকথন ভঙ্গি লক্ষণীয়, যেমন– “সে বড় আশ্চর্য্য কথা গো শুন সখীগণ”[২৩]
  প্রসঙ্গত বাক্যে ‘না’- এর ব্যবহার লক্ষণীয়– “ভোর না হইতে গো সতা সকালে উঠিয়া”[২৪], কিংবা বাক্যে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়– “তারপরে কি হৈল গো শুন দিয়া মন।”[২৫]

চ. সামাজিক সম্পর্ক : এ রামায়ণে 'সখী' অর্থে সমবয়সী, অধিকন্তু তার সমব্যথী নারী হৃদয়ের কাছে সীতার কথা উন্মোচিত হয়েছে। সেই সূত্রধরেই

- মেয়েদের ভাষায় ব্যবহৃত গালিসূচক এমনকিছু শব্দ যা পুরুষরা সাধারণত ব্যবহার করে না, যেমন– ‘রাঁড়ী’, ‘কালনাগিনী’, ‘কালকূট’ প্রভৃতি। কিংবা ‘বিষবাণ’, ‘বিষের হাসি’ এই জাতীয় শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

- এ রামায়ণে তিনবার গর্ভসঞ্চার ও গর্ভলক্ষণের প্রসঙ্গ এসেছে। সে সময়ের খুঁটিনাটি বর্ণনায় মেয়েলি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই। যে বিষয়ে পুরুষ সাধারণত জ্ঞাত থাকে না। সম্ভাষক ও সম্ভাষিত উভয়েই মহিলা হলেই এধরণের বাক্যালাপ সম্ভব।

ছ. প্রকাশের ধরন : বাংলা সাহিত্যে তখন মধ্যযুগ। রচিত সাহিত্য সেকালে মূলত শ্রোতামন্ডলীর কাছে গীত হওয়ার জন্যই লেখা। কবি একদিকে ছিলেন গাথারচয়িতা, তাঁর রামায়ণ রচনাতেও ঐ অঞ্চলের তৎকালে প্রচলিত লোকসাহিত্যের ধাঁচটি ধরা পড়ে। বারে বারে সীতার স্বপ্ন প্রসঙ্গ আসে এবং সেইসূত্রে কাহিনি এগিয়ে যায়— “এক দুই তিন করি পঞ্চমাস গেল,”[২৬] এইভাবে কালের ব্যাপ্তি সংক্ষিপ্ত কাঠামোয় আধৃত। চোদ্দ বছরের বনবাস ‘বারোমাসী’তে রূপান্তরিত; বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের রামায়ণে যে যুদ্ধের বর্ণনা সবথেকে বিস্তৃত— সেই মহাকাব্যিক যুদ্ধসাজ, যুদ্ধের বিবরণ, বীরত্বব্যঞ্জক কোনো বর্ণনাই এখানে নেই। পরিবর্তে, দু'বার স্বপ্ন এবং সেই সঙ্গে ছয় ছত্রে যুদ্ধ প্রসঙ্গ শেষ—

> “মাঘ মাসেতে আমি গো দেখিনু স্বপন।
> রণে মরে ইন্দ্রজিৎ গো রাবণ নন্দন।।...
> ফাল্গুন মাসেতে আমি গো দেখিনু স্বপনে।
> সবংশে মরিল রাবণ গো শ্রীরামের বাণে।।”[২৭]

আমরা জানি, সীতা যুদ্ধ পছন্দ করত না। তাই হয়তো একজন মহিলা কবির কলমেও এই রামায়ণীকথায় যুদ্ধের স্থানাভাব দেখা দিয়েছে। পরিবর্তে, সীতার কাছে ‘লঙ্কার ছারখার’, ‘রাক্ষসের হাহাকারই’ বেশি অনুভববেদ্য হয়েছে রামের বীরত্বের চেয়েও।

- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গীতিধর্মিতা মেনেই এসেছে পালাগানের মতো ধূয়াসহ গানের অনুষঙ্গ— “সরযূ বইয়া চল ধীরে...”[২৮], কিংবা “নিশি না হইও ভোর...”[২৯]।
- মহাকাব্যিক বীররসের অবতারণা বদলে, রামের চরিত্র-মাহাত্ম্যের বদলে এই রামায়ণে পরিবেশিত হয়েছে ‘শুভ-অশুভ দুই মানবিক সত্তার দ্বন্দ্ব’। নারী জগতের প্রতিই আলো ফেলতে চেয়েছেন কবি। ওই শুভ ও অশুভ শিবিরের দুই প্রতিনিধি হিসাবে বলা যায় যথাক্রমে সীতা ও কুকুয়া’র কথা।

জ. স্বাতন্ত্র্য : কবির নামে প্রচলিত অন্য দুটি গীতিকার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, এই সকল রচনার থেকে মহাকাব্য কথার নবনির্মাণে কাহিনি-ভাবনা ও ভাষা ব্যবহারে এবং প্রকাশভঙ্গির বিশিষ্টতায় বিশেষ পার্থক্য।

পালাদুটিতে ব্যবহৃত ভাষা যেখানে একেবারেই লোকভাষা ঘেঁষা, স্থানিক প্রেক্ষাপটের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের পরিচয় পাই। সকল চরিত্রেই সেখানে পল্লীর নিজস্ব সন্তান-সন্ততির জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত।

অন্যদিকে, রামায়ণে বর্ণিত আমাদের পরিচিত চরিত্র সকলকে আমরা নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলের লোকজীবন থেকে আহৃত একথা বলতে পারি না। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূলত মৌখিক-আঞ্চলিক ভাষারীতির ব্যবহার হলেও, স্থানে স্থানে শুদ্ধ-সংলাপ ও ভাষা প্রয়োগ লক্ষণীয়। সেক্ষেত্রে, এই শিষ্ট ও আঞ্চলিক ভাষারীতির মিশ্রণ পরবর্তীকালের গায়েনের দ্বারা সংযোজিত তথা প্রক্ষেপজাত সেকথাও অস্বীকার করা যায় না। এছাড়াও, চন্দ্রাবতীর রামায়ণে কাহিনি ভাবনায় রামের জন্ম প্রসঙ্গে রাজা দশরথের রানীদের ফল ভক্ষণ করে গর্ভবতী হওয়ার কাহিনিটি অভিনব। যা বাল্মিকী কিংবা কৃত্তিবাসে ছিল না।

- অন্যদিকে, কৃত্তিবাসের রামায়ণের অতি পরিচিত লক্ষ্মণগণ্ডির প্রসঙ্গ কিন্তু চন্দ্রাবতীর রামায়ণে নেই। একা সীতাকে কুটিরে রেখে যাওয়ার ক্ষেত্রে কবি কৃত্তিবাস লক্ষ্মণকে দিয়ে একটি সুরক্ষা গণ্ডি টেনে দেন। মহিলা কবি যখন ওই কাহিনি লিখছেন, তখন রামের জন্য সীতার উদ্বেগই বেশি লক্ষণীয়। পরিবর্তে গণ্ডির দ্বারা নির্দেশিত কোনো সীমারেখার কথা কবির মনে স্থান পাচ্ছে না।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 09 - 19
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

- উচ্চারণের কষ্ট লাঘব করার জন্য ভাষাব্যবহারে বেশ কিছু ধ্বনিপরিবর্তন যথা— মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি জাতীয় ধ্বনি পরিবর্তন, ব্যঞ্জনলোপ, কোথাও পূর্ববর্তী স্বরের দীর্ঘীভবন, স্বরসংগতি জনিত ধ্বনি পরিবর্তন, অপিনিহিতির পরবর্তী পর্যায়ের ধ্বনি পরিবর্তন, উচ্চারণের অসাবধানতার ফলে তৈরি হওয়া ধ্বনির বিপর্যাস লক্ষণীয়। এছাড়াও টলমল, ঝলমল ইত্যাদি ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার, দেবতার নামের লোকপ্রচলিত সরল উচ্চারণ লক্ষণীয়, যথা— বিশ্বকর্মা > বিশাই। শিব নামের পরিবর্তে 'বিরিঞ্চি' নামের ব্যবহারও লক্ষ করা যায়।
- ভাষায় ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচনে থাকে জীবন সম্বন্ধে দার্শনিক অনুভূতি যা লোকজীবন সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। চন্দ্রাবতীর রামায়ণে এমনই বেশকিছু প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায়। তা যেমন জীবন দর্শনকে তুলে ধরে তেমনি তা সে যুগের লোকবিশ্বাসকে তুলে ধরে, যা পূর্বাপর সাহিত্যে ও সমাজে সমানভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যেমন,

"দৈবের নির্বন্ধ কভু খণ্ডান না যায়।"[৩০]
"কপালে থাকিলে সুখ গো একদিন আসে।"[৩১]
"পর্ব্বতে মারিলে ঢিল গো কিবা আসে যায়।"[৩২]
"পরের কথা কানে লইলে গো নিজের সর্বনাশ।"[৩৩]
"সোতের শ্যাওলা আমি গো ঘাটে ঘাটে ভাইস্যা বেড়াই।"[৩৪]
এই সকল প্রবাদের ব্যবহার সাহিত্যে মেলে কবির বিশ্বাস ও জীবন অভিজ্ঞতা ফসল হিসাবে।

- এছাড়াও বেশ কিছু লোকবিশ্বাসের ছাপ চোখে পড়ে। প্রসঙ্গত, রামকর্তৃক সীতার নির্বাসনের সময় সীতা তখনও রামের অভিসন্ধিতে অজ্ঞাত। তখন লক্ষ্মণের সঙ্গে বনের পথে যেতে গিয়ে বিভিন্ন ঘটনায় সীতা শিহরিত হয়, যা তার কাছে কুলক্ষণের আভাস দেয়। এরই সূত্রে কবি সীতার বনবাসের প্রাক্কালের তিক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে যেমন সমর্থ হয়েছেন, তেমনি তা লোকসংস্কারের পরিচয় হিসাবে পাঠকের কাছে প্রতিভাত হয়, যেমন—

"মরা বৃক্ষের ডালে বইসা গো কাগায় করে রা।
পন্থের মাঝে কুকুর চলে গো তার ভাঙ্গা একখান পা।।...
দূর থাইক্যা ভাইস্যা আইসে গো হাপুতার ক্রন্দন।।"[৩৫]
— ইত্যাদি ক্ষেত্রে তা লক্ষণীয়।

বিভিন্ন সমাজের নারীমহলে প্রচলিত যেসকল রামায়ণী গানের পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন গবেষণায় ও প্রবন্ধে, তা আসলে রামায়ণের কাহিনির মোড়কে সীতারই গান। নারীসমাজের একেবারে নিজস্ব সংস্কৃতি এসব। আবার ঠিক নিজস্ব বলা যায় না, বিভিন্ন সমাজের, বিভিন্ন রাজ্যের নারীর কণ্ঠে গীত এসকল গানের মধ্যে লক্ষ করা যায় অদ্ভুত মিল। প্রসঙ্গত আমাদের চন্দ্রাবতীর রামায়ণটিও তার ব্যতিক্রম নয়। যে সীতা আদিকাল থেকেই নারীর দুঃখময় জীবনের প্রতীক, সীতাই আদি নায়িকা। কৃত্তিবাসের সীতা সর্বংসহা হলেও নারীমন ওই চরিত্রটিকে মেনে নিতে পারেনি। তাই নারীর কাছে রামায়ণের কথা হয়ে উঠেছে সীতার কথা। নারীমন এক অর্থে সীতার সমব্যথী, আবার সীতাই তাদের চলার পথ বলে দেয়। সীতার চরিত্রে নারী আদর্শের শিক্ষা যেমন পেয়েছে, তেমনি পেয়েছে প্রতিবাদের ভাষা। তাই মধ্যযুগের এক শিক্ষিত বাঙালি নারীমন পিতার আদেশে রামায়ণ রচনায় ব্রতী হওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিধা করে না। ইতিপূর্বে কৃত্তিবাসের হাতে রামের পাশে সীতার মনের কথা যেখানে চাপা পড়ে গেছিল, চন্দ্রাবতীর হাতে সেই সীতার মন ততোধিক উন্মোচিত হয়ে যায়। রামায়ণীকথার কিরূপ প্রতিচ্ছবি নির্মিত হয় নারীমননে, তারই এক লিখিত রূপ দিয়েছিলেন কবি চন্দ্রাবতী ষোড়শ শতকের শেষেরদিকের কোনো এক সময় একটি রূদ্ধদ্বার মন্দিরগর্ভে।

ভাবনায় প্রাধান্য পেয়েছে মূলত নারী চরিত্রের বিভিন্ন রূপদর্শন, নারীর মনের কথা। ভাষার ব্যবহারেও দেখা যায়, উঠে এসেছে জীবন্ত আঞ্চলিক ভাষারূপ। যা উক্ত মৈমনসিংহ অঞ্চলের নারীসমাজের কাছে সুপরিচিত, একেবারে নিজেদের সংস্কৃতি, সম্পদ। আয়তনে সংক্ষিপ্ত হলেও রামায়ণীকথার এক নবরূপ উন্মোচিত হয়। বাংলা ভাষায় লিখিত এই রামায়ণ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 02
Website: https://tirj.org.in, Page No. 09 - 19
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কথার মধ্যে শুধু বাল্মিকী বা কৃত্তিবাস নয়, অন্যান্য দেশের, অন্যান্য সমাজের প্রচলিত রামকথার সঙ্গে যে যোগসূত্র মেলে তাতেও এই রামায়ণটির সাহিত্যিক আবেদন কম কিসের?

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন একলা কবি ও মহাকবির কথা এবং দুই কবির ক্ষেত্রে পার্থক্য কোথায় সেকথা। চন্দ্রাবতী মহাকাব্যের কাহিনি নিয়েছিলেন, তবে হয়তো মহাকবি হওয়ার আশা বা গর্ব নিয়ে নয়। লেখনীতে রেখেছিলেন নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন, ভাষা ব্যবহারেও যা স্বতন্ত্র। যা ক্রমেই সে অঞ্চলে বিশেষত, নারীমহলে বিপুল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, দীর্ঘকাল ধরে যা প্রচলিত হয়ে লোকের মুখে মুখে ফিরেছে। তাই সবার কথা থেকে এর যাত্রাপথ যেমন একঅর্থে একলা কবির কথায়, তেমনি একলা নারীর কথা থেকে সমগ্র নারী সমাজের কথায়। যার দ্বারা বাংলা সাহিত্যে উদ্ভাসিত হয় এক দিগন্ত, সেকালের নারীর চিন্তা-চেতনার জগতের প্রকাশের দিগন্ত।

Reference:

১. দেবসেন, নবনীতা : ১৯৯৭, ‘বামাবোধিনী’, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৫০
২. সেন, দীনেশচন্দ্র (সম্পাদিত): ২০১৫, ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’, প্রজ্ঞা বিকাশ, নব সংস্করণ, পৃ. ১১৯
৩. তদেব, পৃ. ১২০
৪. তদেব, পৃ. ১২১
৫. তদেব, পৃ. ১২৪
৬. তদেব,পৃ.- ১২৪
৭. মজুমদার, অভিজিৎ : ২০০৭, শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, দে’জ পাবলিশিং, পৃ. ১৪
৮. তদেব, পৃ. ২৬
৯. তদেব, পৃ. ২৬
১০. মুখোপাধ্যায়, সুখময় (স.) : রামায়ণ : কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিরচিত,ভারবি,তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫২৪
১১. সেন, দীনেশচন্দ্র (স.) : ২০০৯, পূর্ববঙ্গগীতিকা (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড একত্রে), দে’জ পাবলিশিং, পৃ. ১৪১৬
১২. মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র (স.) : ১৯৭৫, প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (সপ্তম খণ্ড), ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৩৮২
১৩. সেন, দীনেশচন্দ্র (স.): ২০০৯, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ঐ, পৃ. ১৩৯১
১৪. তদেব, পৃ. ১৩৯৫
১৫. মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র (স.) : ১৯৭৫, প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা, পৃ. ৩৩৫
১৬. সেন, দীনেশচন্দ্র (স.) : ২০০৯, পূর্ববঙ্গগীতিকা, ঐ, পৃ. ১৩৯৭
১৭. তদেব, পৃ. ১৪১২
১৮. সেন, দীনেশচন্দ্র (স.) : ২০০৯, পূর্ববঙ্গগীতিকা, ঐ, পৃ. ১৩৯৪
১৯. তদেব, পৃ. ১৩৯৪
২০. তদেব, পৃ. ১৪১৩
২১. তদেব, পৃ. ১৪০৫
২২. সেন, দীনেশচন্দ্র : মার্চ ২০২১, ষষ্ঠ সংস্করণ, বৃহৎ বঙ্গ (দ্বিতীয় খণ্ড), দে’জ পাবলিশিং, পৃ. ৯৮০
২৩. তদেব, পৃ. ১৩৯৯
২৪. তদেব, পৃ. ১৪০০
২৫. মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র (স.) : ১৯৭৫, প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা, ঐ, পৃ. ৩৪৫
২৬. সেন, দীনেশচন্দ্র (স.): ২০০৯, পূর্ববঙ্গগীতিকা, ঐ, পৃ. ১৪০২
২৭. তদেব, পৃ. ১৪১১
২৮. মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র (স.): ১৯৭৫, প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা, ঐ, পৃ. ৩২৮

২৯. তদেব, পৃ. ৩৩২
৩০. সেন, দীনেশচন্দ্র (স.) : ২০০৯, পূর্ববঙ্গগীতিকা, ঐ, পৃ. ১৩৯৬
৩১. তদেব, পৃ. ১৩৯৯
৩২. তদেব, পৃ. ১৪০৯
৩৩. তদেব, পৃ. ১৪১৬
৩৪. মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র (স.) : ১৯৭৫, প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ঐ, পৃ. ৩৩৪
৩৫. তদেব, পৃ. ৩৩৩

Bibliography:

আকরগ্রন্থ :

মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র (সম্পাদিত), *প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা (সপ্তম খণ্ড),* কলকাতা : ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৫
সেন, দীনেশচন্দ্র (সম্পাদিত), *পূর্ববঙ্গ গীতিকা (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড একত্রে),* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯

সহায়ক গ্রন্থ :

গুপ্ত, ক্ষেত্র, *বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস,* কলকাতা : গ্রন্থনিলয়, বিংশতি সংস্করণ, ২০১৪
চক্রবর্তী, উদয়কুমার, *নারীর ভাষা ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* কলকাতা : ইন্দাস পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলার্স, ২০০৬
চক্রবর্তী, কোয়েল, *চন্দ্রাবতীর জীবন ও রামায়ণ,* কলকাতা : অপর্ণা বুক ডিসট্রিবিউটার্স, ২০০৯
চক্রবর্তী, বরুণকুমার, *গীতিকা: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য,* কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৯৩
দাস, অপু, *বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ : নারীবাদী পাঠ,* কলকাতা : বাণীশিল্প, ২০১৬
দে, আশিসকুমার, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য : ভাষাপট ও ভাবকথা,* কলকাতা : শৈলী, ১৯৯৭
দেবসেন, নবনীতা, *'বামা-বোধিনী',* কলকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭
দেবসেন, নবনীতা, *'সীতা থেকে শুরু',* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩
দেবসেন, নবনীতা, *চন্দ্র-মল্লিকা এবং প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯ নভেম্বর
নাথ, মৃণাল, *ভাষা ও সমাজ,* কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৯
বসু দত্ত, শর্মিলা, *বাংলায় মেয়েদের ভাষা,* কলকাতা : প্রমা প্রকাশনী, ২০০০
মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পাদিত), *রামায়ণ: কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিরচিত,* কলকাতা : ভারবি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৫
মজুমদার, অভিজিৎ, *শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭
শ', রামেশ্বর, *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা,* কলকাতা : পুস্তক বিপণি, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ
সেন, দীনেশচন্দ্র, *বৃহৎ বঙ্গ (দ্বিতীয় খণ্ড),* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সংস্করণ, মার্চ ২০২১
সেন, দীনেশচন্দ্র, *মৈমনসিংহ গীতিকা,* কলকাতা : প্রজ্ঞা বিকাশ, নব সংস্করণ, ২০১৫
সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড),* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪২২ বঙ্গাব্দ
হালদার, গোপাল, *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (প্রথম খণ্ড : প্রাচীন ও মধ্যযুগ),* কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

পত্র-পত্রিকা :

ভৌমিক, তাপস (সম্পাদক), *কোরক,* রামায়ণ সংখ্যা, কলকাতা, শারদ ১৪০৫
মুখোপাধ্যায়, অনুশাসন (সম্পাদক), *দশদিশি, বিষয় কৃত্তিবাসী রামায়ণ,* কলকাতা : প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ, ২০১১